মায়াবাদ (The Doctrine of Maya):

এক অর্থে বিবেকানন্দকে 'নব্য-বৈদান্তিক' (Neo- Vedantist) বলা যায়। কেননা, তিনি মায়াবাদের এক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করেছেন তাঁর দর্শনে। একথা সত্য যে তিনি অদ্বৈত বেদান্ত থেকে মায়া তত্ত্বকে ধার নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মায়া সম্পর্কিত মতবাদ শঙ্করাচার্যের মতবাদের অবিকল প্রতিরূপ নয়। শঙ্করাচার্যের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন, মায়া সৃষ্টিকর্তার শক্তি বিশেষ, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তে বলা হয়েছে মায়াশক্তি ভ্রম সৃষ্টিকারী। এই ঐশ্বরিক শক্তি মানব মনে এমন বিশ্বাস উৎপাদনে সক্ষম যে, এই জগৎ সত্য। কিন্তু বিবেকানন্দ এই মত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, মায়া আবশ্যিকভাবে 'কুহক' অথবা অসত্যকে নির্দেশ করে না। বরং এই শব্দটির দ্বারা

Scanned by CamScanner

জগতের ঘটনা সমূহের কথা বলা হয়। জগতের অন্তর্নিহিত ও অনিবার্য চরিত্রটিই প্রকাশ করা হয়।

তাঁর ভাষায় বিষয়টি এইরকম : মায়া সংসার রহস্যের ব্যাখ্যার জন্য একটা মতবাদ নয়,সংসারের ঘটনা যে ভাবে চলছে, মায়া তারই বর্ণনা মাত্র। অর্থাৎ এটা বলা চলে যে, বিরুদ্ধতাই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি। সর্বত্র এই ভয়ানক বিরোধের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। যেখানে মঙ্গল সেখানেই অমঙ্গল, যেখানে অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, সেইখানেই ছায়ার মতো মৃত্যু তার অনুসরণ করছে। যে হাসছে, তাকে কাঁদতে হবে। যে কাঁদছে, সে হাসবে। এ অবস্থার প্রতিকারও সম্ভব নয়। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করতে পারি যেখানে কেবলমাত্র নেই থাকবে, অমঙ্গল থাকবে না, যেখানে আমরা কেবল হাসব, কাঁদব না। কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্বত্র বিদ্যমান, তখন এরূপ ঘটনা স্বতই অসম্ভব। যেখানে আমাদের হাসাবার শক্তি আছে, কাঁদাবার শক্তিও সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে। যেখানে সুখোৎপাদক শক্তি আছে। দুঃখজনক শক্তিও সেখানে লুকানো আছে।

'...এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গলের, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ। একটিকে বাড়াও দেখবে অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হতে পারে না। এরকম ধারণাই স্ব-বিরোধী।' সুতরাং 'মায়া' হল 'বিরুদ্ধতা' (contradiction) তত্ত্বের সুবিধাজনক একটা নাম যার দ্বারা জগতকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা যায়। আমাদের সমগ্র জীবন হল এই বিরুদ্ধতা। সত্ত ও অ-সত্তর সমাহার। এক সময় আসে, যখন মনে হয় কোন ব্যক্তি সমস্ত কিছুকে জানে, সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে পারে। আবার এমন এক সময় আসে, যখন সেই ব্যক্তিই ভাবে তার সামনে এক অনতিক্রম্য বাধা রয়েছে। তার কার্যক্রম চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। এই আবর্তের বাইরে সে যেতে পারে না'।

বিবেকানন্দ বলছেন, যাকে তুমি জড় বল, আত্মা বল, অথবা মন বল অথবা যা কিছু বল, ঘটনা একই থাকে, তাকে 'আছে' বলাও যায় না, আবার তাকে 'নাই' বলতেও পারি না। আমরা তাকে 'এক' বলতেও পারি না। আবার তাকে 'বহু' বলতেও পারি না। চিরন্তন আলো-অন্ধকারে খেলা চলেছে—যাকে কোনভাবেই বিভাজন করা যায় না। 'মায়া' হল এই 'ঘটনা' মাত্র।

মায়ার এই ব্যাখ্যার একটি বিরাট সুবিধা আছে। এই ব্যাখ্যা যদিও বৈদান্তিক ব্যাখ্যার থেকে পৃথক, কিন্তু বৈদান্তিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধতা করে না। বেদান্তে বলা হয়েছে, মায়া হল ঐশ্বরিক শক্তি—যার দ্বারা 'জগৎ ভ্রম' (World-illusion) সৃষ্টি হয়। বিবেকানন্দ তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন : এই শক্তি নিজে ভালও নয় মন্দও নয়—এটি নিরপেক্ষ। সুতরাং মায়ার এক নিরপেক্ষ চরিত্র আছে। মায়ার এই নিরপেক্ষ চরিত্রকে জানা যায়, কেবলমাত্র যদি মায়াকে জগতের নানা স্ব-বিরোধিতার একটি নাম হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

বিবেকানন্দ একথা স্বীকার করেছিলেন কেবল নিম্নের দৃষ্টিকোণ থেকে মায়ার সত্যতা আছে। তবে তিনি জানতেন, পরিণামে সমস্ত বিরুদ্ধতার অবসান ঘটবে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি উপমা ব্যবহার করেছেন। 'সাগর এবং তার ঢেউ।' সাগরের ঢেউগুলো সাগরেরই জল ছাড়া আর কিছু নয়, তবু তাদের আলাদা রূপ আর নাম আছে। ঢেউকে কি সাগর থেকে একেবারে পৃথক করে চিন্তা করতে পারি? কখনই না সমুদ্রের ধারণার ওপরই তা নির্ভর করছে। যদি ওই

Scanned by CamScanner

ঢেউ চলে যায় তাহলে রূপও অন্তর্হিত হল। কিন্তু ঐ রূপটি যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল তাও নয়। যতক্ষণ ওই ঢেউ ছিল ততক্ষণ রূপও ছিল এবং বাধ্য হয়ে সেই রূপও তোমাকে দেখতে হত—এই-ই হল মায়া। অতএব এই সমগ্র জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ। ব্রহ্মই সেই সাগর আর তুমি-আমি সূর্য, তারা - সবই সেই সাগরের ভিন্ন ভিন্ন ঢেউ শুধু। ঢেউকে সাগর থেকে ভিন্ন করে কে? রূপ। আর ওই রূপ-দেশ-কাল-নিমিত্তের ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই দেশ-কাল-নিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ওই ঢেউগুলোর ওপর নির্ভর করছে। যেই ঢেউ চলে গেল অমনি সবই চলে গেল। জীবাত্মা যখনই এ মায়া পরিত্যাগ করে, তখনই তার কাছে তা অন্তর্হিত হয়, সে মুক্ত হয়ে যায়। আমাদের সব চেষ্টাই এই দেশ-কাল-নিমিত্তের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। এরা সব সময় আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিচ্ছে আর আমরা চেষ্টা করছি এর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে।'

বেদান্তে যেমন মায়াকে 'অনির্বচনীয়' বলা হয়েছে, বিবেকানন্দও একই রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন যখন তিনি বলছেন, মায়াকে অস্তিত্বশীল অথবা অনস্তিত্বশীল বলা যায় না। চরম সত্তা এবং অসত্তার মাঝেই মায়াকে তিনি স্থাপন করেছেন। তিনি বলছেন, 'শূন্য থেকে কিছুরই উৎপত্তি হয় না। সকল জিনিসই অনন্তকাল রয়েছে এবং থাকবেও অনন্তকাল। কাল ঢেউয়ের মতো একবার উঠছে আবার পড়ছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার লয়, স্থূল ব্যক্তভাবে প্রকাশ—সমগ্র প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ চলছে। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের আগে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এখন নানারূপে ব্যক্ত হয়েছে, আবার ক্রমসঙ্কুচিত হয়ে অব্যক্ত ভাব ধারণ করবে।'

Scanned by CamScanner

যে তার।'

কর্মের পথ (কর্মযোগ):

বিবেকানন্দের মতে, 'কর্মযোগ হল কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করা। ভালো অথবা মন্দ কর্ম করলে ওই কর্মের ফল অবশ্যই ভালো বা মন্দ হবে। যদি অন্য কোন কারণ না থাকে তবে কোনো শক্তিই তার কাজ রোধ করতে পারে না। সৎকর্মের ফল সৎ এবং অসৎ কর্মের ফল অসৎ হবে। এবং মুক্তির কোনো সম্ভাবনা না রেখে আত্মা চিরবন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে। কর্মের ভোক্তা দেহ অথবা মন। আত্মা কখনই কর্মের ভোক্তা হতে পারেনা; কর্ম কেবল আত্মার সম্মুখে একটি আবরণ নিক্ষেপ করতে পারে। অবিদ্যা - অশুভ কর্মের দ্বারা নিক্ষিপ্ত আবরণ। সৎ কর্ম নৈতিক শক্তিকে দৃঢ় করতে পারে এবং এইভাবে নৈতিক শক্তির দ্বারা অনাসক্তির অভ্যাস হয়। নৈতিক শক্তি অসৎ কর্মের প্রবণতা উৎপাদন করে এবং চিত্ত শুদ্ধ করে। কিন্তু যদি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম করা হয়, তাহলে ওই কর্ম সেই বিশেষ ভোগটি উৎপাদন করলেও চিত্ত শুদ্ধ করবে না। সুতরাং ফলাসক্তিশূন্য হয়ে সমস্ত কর্ম করতে হবে।

কর্মযোগীকে সমস্ত ভয় ও ইহামুত্রফলভোগ চিরকালের জন্যে ত্যাগ করতে হবে। উপরন্তু এষণাবিহীন কর্মসকল বন্ধনের মূল স্বার্থপরতা বিনষ্ট করবে। কর্মযোগীর মূলমন্ত্র "নাহং নাহং,

Scanned by CamScanner

তুই তুই" এবং কোনো আত্মত্যাগই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্বর্গপ্রাপ্তি নাম, যশ বা কোনো জাগতিক সিদ্ধির জন্য তিনি কর্ম করেন না। এই নিঃস্বার্থ কর্মের ব্যাখ্যা ও উপপত্তি কেবল জ্ঞানযোগেই আছে।'

প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের উদাহরণ দিয়ে কর্মযোগের পথ সম্পর্কে বলেছেন, 'গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেয়। যোগারূঢ় হয়ে আমাদের কর্ম করতে হবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ছোট্ট 'অহং' বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করলে 'আমি এটা করেছি, ওটা করেছি'— এই বোধ কখনও থাকে না। পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা এই বোধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা বলে যে, যদি এই অহংবোধ না থাকে, যদি এটা বিলুপ্ত হয় তবে মানুষ কিভাবে কর্ম করতে পারে? কিন্তু আমিত্ববোধ ত্যাগ করে যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করলে তা অনন্তগুণ উৎকৃষ্টতর হবে এবং প্রত্যেকেই নিজের জীবনে এটা অনুভব করে থাকবে।

আমরা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি। অন্যান্য অনেক কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোভে যেন সমাধিমগ্ন হয়ে করি। চিত্রকর যদি অহংবোধ ভুলে চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর ছবিগুলো আঁকতে পারবে। ভালো পাচক যেসব খাদ্যবস্তু নিয়ে কাজ করে, তাতেই সে সম্পূর্ণ মন দিয়ে থাকে। তখন সাময়িকভাবে তার অন্যান্য বোধ সবই চলে যায়। এভাবেই তারা তাদের অভ্যস্ত কোনো কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এভাবে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন, তিনি যোগযুক্ত হয়ে সমস্ত কর্ম করেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ খোঁজেন না। এভাবে কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়। তা থেকে কোনো অমঙ্গল হতে পারে না।'

তিনি মনে করতেন এই নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই আমাদের মন শুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং আমরা সকলের সাথে নিজেকে এক করে চিনতে পারি। এই উপলব্ধিই অমরত্ব।

মনোবিজ্ঞানের পথ (রাজযোগ):

Scanned by CamScanner